নবম অধ্যায়

বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর : বাস্তব ও অধিবাস্তবতার দ্বিরালাপ

১৯৯৫ সালে জানুয়ারি মাসে কলকাতা বইমেলায় দে'জ পাবলিশিং থেকে অভিজিৎ সেন-এর 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে উত্তর বাংলার প্রত্যন্ত অন্ত্যজ গ্রামাঞ্চলের জনজীবনের অন্দরমহলের দৈনন্দিন ছবি তিনি তুলে ধরেছে। অভিজিৎ দেখিয়েছেন সত্তর-আশির দশকে গ্রাম বাংলার জনমানসে ধর্মীয় কুসংস্কার, গোঁড়ামি, রীতিনীতি কতটা তীব্র ছিল। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের উপাদান 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। ঔপন্যাসিক একদিকে যেমন গ্রাম্য সাধারণ খেটে খাওয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করা মানুষদের তুলে ধরেছেন তেমনি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার, আচারকে তুলে ধরে দেখিয়েছেন। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বালা লখিন্দর। মা মায়নোমতি এই বালাকে অনেক তপস্যার পর কোলে পেয়েছে বলে তার বিশ্বাস। চৌদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয় মায়নোমতির। বিয়ের ছ-বছর পরও কোনো সন্তান না হওয়ায় বাঁজী বলে দূর্নাম হয় তার। একজন মেয়েমানুষের কাছে সন্তানহীনা এই অপবাদটি চরম অবমাননাকর। সমাজও তাদের আলাদা নজরে দেখে। তাই আক্ষেপ করে মায়নোমতি তার সইকে বলে—

> *"ছোল যদি হামার মুখোৎ নাতিও মারে, তমসে মোর ছোল চায়! ছোল যদি মোক না খাইতে দিয়া প্যাট-শুটকা দিয়াও মারে, তম্‌মো মোর ছোল চাই।"*[১]

সন্তান পাওয়ার আশায় মায়নোমতি কালির থানে পুজো দেয়, মানত করে তবুও সন্তান হয় না। অবশেষে শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে জলে কাদায় ডোবা প্রায় দু-ক্রোশ রাস্তা দণ্ডি করে মায়নোমতি মঙ্গলবার বিষহরির থানে মানত রক্ষা করেছিল। শরীর তার রক্তাক্ত। সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে। মায়নোমতি বুকে ছুরি দিয়ে সেই রক্ত মায়ের থানে দেয়। এত কষ্ট, এত মানত, রক্ষা করার পর মায়নোমতি তার সন্তান পায়। এই সেই সন্তান বালা লখিন্দর। বাবা রাজকিশোর মা মায়নোমতির একমাত্র সন্তান। চব্বিশ বছর বয়সে নওজোয়ান পুরুষ। এই পুরুষকে ঘায়েল করে বিদ্যাধরী নামী এক রূপশী কন্যা। যে তার গর্ভের অবৈধ সন্তান নিয়ে এ গ্রামে আসে এবং কবিরাজের কাছে ঠাঁই পায়। কবিরাজের ঢেমনি নামে সে পরিচিত হয়। সেই মায়াবী রূপশ্রী বিদ্যাধরী বালা-লখিন্দরকে তার মোহ জালে আবদ্ধ করে। আর এখানেই মা মায়নোমতির দ্বন্দ্ব। মায়নোমতি কোনো মতেই এই মেয়েকে তার পুত্রবধূ হিসেবে স্বীকার করতে রাজি হয়নি। তাই সে পঞ্চায়েতের কাছে বিচার প্রার্থনা করতে চেয়ে স্বামীকে বলে—

> *"ওই পাঁচঘাটের জল খাওয়া ড্যান মাগী হামার ছোলটাক গিল্যে খাববে, অ্যাংকা মান্‌সে সহ্য কইরবে। পঞ্চাইতের কাছে মঁয় আর্জি দিমো, ওয়ার চুল কাইটে, নাকখৎ দিয়ে অঞ্চল থিকা তাড়াবা হোবে।"*[২]

লখিন্দরের বাবা রাজকিশোর দশখানা তাঁতের মালিক। সমুদ্রগড়ের মহাজনের কাছ থেকে সুতোর আর সিল্কের দাদন আনে সে। এদিকে বালা ইস্কুলে পড়া কিছু শিখেছিল। কারণ দশখানা তাঁতের মালিক যে তাদের পড়ালেখার অতবেশি প্রয়োজন নেই। সামান্য হিসেব-নিকেশ করতে পারলেই তাতেই চলে যায়। বালা সুতোর গুনতি, চৌকশ নকসার হিসাব বোঝে। তৈরি করা কাপড় নিয়ে বালা সমুদ্রগড়ের মহাজনের কাছে দিয়ে, টাকা-পয়সার হিসাব করে নিয়ে

আসে। এতদিন সব ঠিকই ছিল। কিন্তু বিদ্যাধরীর রূপের আগুনে পুড়ে ও তার মোহনীয়তায় ধরা দিয়ে বালা তার বাপের প্রায় বিশ হাজার টাকার সিল্কের শাড়ি নিয়ে সমুদ্রগড়ের মহাজনের কাছে যাবে বলে বেরোলেও আর সে ফেরে নি। এদিকে দাদনের মাল নিয়ে রাজকিশোরের কখনো দু-কথা হয় নি। মহাজনের বেশ সুনজরে ছিল সে। ষোলশ-আঠারোশো টাকা জোড়া এমন মানের শাড়িও তৈরি হতো তার কারখানায়। দশখানা তাঁতের কারবারি রাজকিশোর, স্বজন ও বাইরের লোকজন নিয়ে আট-দশজন কর্মচারী। তাদের মজুরির কথা সবসময় ভাবতে হয় রাজকিশোরকে। এখন রাজকিশোরের মাত্র তিনখানা তাঁত চলছে। বালা যখন বিশহাজার টাকার সিল্কের শাড়ি নিয়ে রওয়ানা হয়েছিল তখন কথা ছিল এবার বেশি পরিমাণে সুতো এবং সিল্ক নিয়ে আসবে। কিন্তু জোয়ান ছেলের অপকীর্তিতে রাজকিশোর অপদস্ত হয় ভেঙে পড়ে। সারাজীবন ধরে রাজকিশোর উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনা নিয়ে কাপড়ের বুননের প্রতিটি ইঞ্চির রহস্য উন্মোচন হতে দেখেছে। রাজকিশোরের সেই তাঁতঘর আজ বন্ধ।

সেই বন্ধ তাঁত ঘরে আর একটি ঘটনা ঘটে। তাঁতের পারডোবার মধ্যে একটি সাপ লুকিয়ে দিল। সেটা বালার তাঁতের পারডোবার মধ্যেই। মহেন্দ্র অর্থাৎ রাজকিশোরের ভাগ্নে তা অনুভব করে এবং ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। একখানা মাছমারা কোঁচ নিয়ে মহেন্দ্র ঘরে ঢুকে তারপর কোঁচে গাঁথা একখানা সাপ সে নিয়ে বেরিয়ে আসে। মহেন্দ্রকে দেখে মায়নো বারবার মুখ থেকে একই সঙ্গে,—

"মারিস না, মারিস না, এবং মারনি!"[৩]

ভয়ে আতঙ্কে এই কথাগুলো বলতে থাকে। কোঁচে গাঁথা সাপ দেখে মায়নো বার দুয়েক চিৎকার করে এবং শরীরে খিচুনি ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। রাজকিশোর মহেন্দ্রকে গালি মন্দ দিয়ে বলে—

"আকাম করলু, হারামদাজা! এ বাড়িৎ সাপ মারা নিষেধ জানা নাই তোর আহাম্মক! কী সব্বোনাশ করলু! অ্যাঁ!"[৪]

ইত্যাদি অন্ধসংস্কার অথচ বিশ্বাসে পরিপূর্ণ চিত্র অভিজিৎ পাঠকে সামনে তুলে ধরেছেন।

বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর উপন্যাসে রাজকিশোরের চরিত্রে ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার লক্ষণ দেখতে পাই। রাজকিশোরের বাড়িঘর পরিষ্কার রাখার কাজের মেয়েটির বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক ফ্রায়েডীয় চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন—

"মেয়ে ছড়া দেওয়া শেষ করে ঝাঁটা হাতে ইষৎ ঝুঁকে পড়ল। তখন রাজকিশোর দেখলো মেয়েটি অসম্ভব যৌনবতী। রাজকিশোর আগে তাকে কখনো এভাবে লক্ষ্য করেনি। মেয়েটি মাস তিনেক হল সন্তানবতী হয়েছে। ফলে তার শরীরে এমন একটা বিপর্যয়কর ঢালো ঢালো ভাব যা রাজকিশোরের বয়সী মানুষকেও উদাসীন থাকতে দিল না। উঠানটা বেশ বড়, কাজেই ঝাঁট দিতে সময় লাগছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে রাজকিশোরের খেয়াল হল পূর্বরাত্রের নির্ঘুম দুশ্চিন্তা ও মর্মবেদনা চাপা পড়ে গিয়ে বিচিত্র এক আকাঙক্ষা তাকে ক্রমশ উজ্জীবিত করতে শুরু করেছে।"[৫]

মানুষের অবচেতন মনে কী চেতনা কাজ করছে একথা নিজের ও বলা মুশকিল। রাজকিশোরের এরকম অনুভূতি চিন্তা চেতনায় নতুন দোলা নিয়ে আসে। অথচ রাজকিশোর বালাকে নিয়ে গভীর এক সমস্যায় পড়েছে আর

বালার মা মায়নোমতির শরীরও দিন দিন ছেলের জন্য অবনতির দিকে যাচ্ছে ঠিক এই মুহূর্তে রাজকিশোরের মনে এই রকম চিন্তার উদয় মনোবিকলন তত্ত্বেরই উদাহরণ। হয়তো মানুষ যখন অসহায়, সমস্যায় জর্জরিত হয় তখনই হয়তো মানুষের অবচেতন মন তা থেকে উত্তরণের বিকল্প খোঁজে যে কোনোও উপায়ে। অভিজিৎ সেন ফ্রায়েডীয় মনস্তত্ত্বটিকে এখানে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন।

আবার অচৈতন্য মায়নোমতিকে কাজের মেয়েটি যখন তুলে ধরে তার মাথাটি নিজের উরুর উপর রাখে তখন রাজকিশোর মায়নোর অন্য পাশে এসে ঝুঁকে বসে। মায়নোকে সচেতন করার চেষ্টা করে। মায়নোর দাঁতে দাঁত লেগে আছে। কিন্তু মায়নোর মুখমণ্ডল ছাড়িয়ে মেয়েটির সুডৌল উরুর উপরে বারবার চোখ পিছলে যেতে লাগল রাজকিশোরের—

> *"সমস্ত উঠানে ছড়ানো গোবর গোলা জল ছড়ার হালকা অ্যামোনিয়ার গন্ধা গন্ধ মেয়েটার হাতেও। কিন্তু এরকম বিপন্ন অবস্থাতেও রাজকিশোর সেই অ্যামোনিয়ার গন্ধ ছাপিয়ে ওঠা একটা সুপক্ক জলপাই এর গন্ধ নাকভরে টানল। উষ্ণ এবং ভারী পাকা জলপাইয়ের গন্ধ মেয়েটার গায়ে যা অবশ্যই তার শরীর থেকে বেরিয়েছে। বেরিয়ে কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে আটকে থেকে, কাপড়ের তন্তুতে তন্তুতে ঘামের সঙ্গে মিশে গিয়ে কেমন মদির সেই গন্ধা"* [৬]

মনোবিকলন তত্ত্বের সুন্দর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন অভিজিৎ সেন, 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। মানসিক অবদমিত ইচ্ছার প্রকাশ কখন, কোথায়, কীভাবে ঘটে তা মানুষ নিজেও জানে না। মানুষের এই আদিম সত্তা জাগ্রত হওয়া তার অতীতকে মনে করিয়ে দেয়। নইলে সন্তান যখন

বিবাগী, ব্যবসা টালমাটাল, সামাজিক সংকট, স্ত্রীর অসুস্থতা ইত্যাদি চারিদিক থেকে যখন রাজকিশোরের জরাজীর্ণ দশা, সেই দশাতেই বাড়ির পরিচারিকার দেহের ভরা যৌবনের উপর আবেগপূর্ণ দৃষ্টিপাত অবদমিত ইচ্ছারই প্রকাশ।

মাইনোমতির সই শৈলী। তার স্বামী কানাই দাস মাইনোমতি আর তার সই শৈলী উভয়ে উভয়কেই নিজেদের গোপন কথা এখনও বলে। না বললে উভয়েরই পেট ফুলে যায়। এই বয়সেও তাদের মধ্যে গোপন কথা থাকে শুনে হয়তো আমরা পাঠকেরা বিস্মিত হই। কিন্তু এটা বাস্তব। মেয়েলী জীবন সংকীর্ণ ও ছোট। স্বামী, সন্তান, ঘর-দুয়ার, সেবা-যত্ন, কিছু প্রতিবেশী এই নিয়েই তাদের জীবন যাপনের সীমানা। তাই সই শৈলীর সঙ্গে গোপন কথার আদান-প্রদানে উভয়েই সুখ পায়। সুখ ও শান্তি নিতান্তই ব্যক্তিগত এবং তা পাওয়ার পন্থাও ব্যক্তিগত ও গোপনীয়। শৈলীর মুখ একটু আলগা, মুখে কিছু আটকায় না। তাই লখিন্দরের বিয়ের আলোচনায় শৈলী বলে ওঠে—

> *"বালার বিহা দি' মায়নো, নাতে কোন দিন কোন ড্যানে টপ্ কইরে না গিলা ফেলায়। চ্যায়ড়াখান যা হইছে, সেকালে দেখা হইলে মঁয়ই খাইয়ে লিতাম হয়ত বা।"*[৭]

এরকম ভদ্রেতর নিছক রসিকতাও অবান্তর কিছু নয়। মায়নোমতি সইকে সই সুলভ ভঙ্গিতে এক চড় মারে তারপর বলে, হারামজাদী তোর মুখে কিছুই আটকায় না। তারপর মায়নো যা বলে তাও ভদ্রেতর গ্রাম্য রসিকতা। সত্য-অসত্য বাস্তব-অবাস্তব সব মিলিয়েই এ যেন এক ভিন্ন রসের উপহার দেন ঔপন্যাসিক—

> *"হারামজাদী, মুখোৎ কেছু আটকায় না। দু-দু খান পুরুষের মানুষের নীচে শুয়েও তোমার শখ মিটে*

নাই, দিন-ভাতারি হলে তবে তোমার খিদা মিটত!"[৮]

'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখীন্দর' উপন্যাসের সঙ্গে মধ্যযুগের চাঁদ সদাগর-বেহুলা-লখিন্দর আখ্যানের অনেকটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বাস্তব ও অধিবাস্তবতার মেল বন্ধন এখানে লক্ষণীয়। পৌরাণিক বেহুলা সতী তার স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে কলার মান্দামে ভেসে স্বর্গপুরীতে গিয়ে দেবতাদের তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখীন্দর' উপন্যাসে বালা লখিন্দর বেহুলারূপা বিদ্যাধরীর রূপজালে, মোহগ্রস্থ হয়ে বিচারবুদ্ধি হারিয়েছে। পৌরাণিক কাহিনিকে অভিজিৎ সেন সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিক রূপদিয়ে নতুন আঙ্গিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যার মধ্যে আধুনিক সাহিত্যের নতুন রূপরেখা ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার ছায়া রয়েছে। উপন্যাসের বালা লখিন্দর নামের সাদৃশ্যের জন্য স্বপ্ন দেখে—

> *"দেখনো ভাদ্দর মাসের ভরা নদী, কিন্তু তাৎ টান নাই অ্যাটটু অ্যানাও বুঝিছ? মঁয় তার উপর দিয়া ভাইসে যাছোঁ।"*[৯]

শুনে মা মায়নো আঁতকে উঠেছিল। কারণ বালা লখিন্দর মনসারই দান। ভাদ্রে নদী ভয়ঙ্কর রাক্ষসী থাকে৷ নিশ্চয় এ স্বপ্নের কোনও বিশেষ অর্থ বা ইঙ্গিত আছে ভেবে মায়নোমতি ব্যাকুল শংকিত হয়। তার নাম বালা লখিন্দর, বিষহরির থানে অনেক কষ্ট করে মানত করার পর মায়নোমতি তাকে পেয়েছিল বলেই কি সে স্বপ্ন দেখে জলের উপর ভেসে চলার। নাকি এ শুধু মনের ভ্রম। এর উত্তর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বাস্তব-অধিবাস্তবতার এই মেল বন্ধনকেই ঔপন্যাসিক মূলত দেখাতে চেয়েছেন উপন্যাসে।

মায়নোমতি ছেলে বয়সে বালাকে কখনও বন্ধুদের সঙ্গে কলার ভেলায় চাপতে দেয়নি। কারণ বালা মা মনসার দান। এখানে মায়নোর বিশ্বাস বাস্তব

না অধিবাস্তব। নাকি নিতান্তই মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা তার সন্তানের জন্য। এদিকে রাজকিশোর দাসের তাঁতঘর ছাওয়ার জন্য বাঁশের দরকার। বর্ষাটা কোনো রকমে টেনে-টুনে চলে গেলেও কার্ত্তিকমাসে ঘর তাকে ছাইতেই হবে। তার জন্য প্রয়োজন অনেকগুলো বাঁশের। উজানে মাইল দশেক দূরে একটা গ্রাম থেকে বাঁশ আনতে হবে। গরুর গাড়ি করে রাস্তা দিয়ে বাঁশ নিয়ে আসা প্রচণ্ড ঝামেলার কাজ তাই জলপথে নদী দিয়েই বাঁশ আনতে হবে। প্রায় তিনশো বাঁশের ভড সাজিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে। একাজে যোগেন সিদ্ধহস্ত কিন্তু মনসার আজ্ঞায় হোক বা বালার ইচ্ছায়-ই হোক একাজে তার সহযোগী হয় বালা লাখিন্দর। স্রোতের মুখে লাগি ঠেলে নিয়ে আসতে হয়। নদীতে পলি পড়েছে, জোর বেড়েছে, জলের গভীরতা তেমন নেই। তাই কঠিন কাজ সাবধানে করতে হবে। এলুয়ার বাঁক সম্বন্ধে একটা সাবধান বাণী রাজকিশোরের ছিল কিন্তু যোগেন তা ভুলে যায়। এলুয়ার বাঁক নাকি মায়াবি জায়গা। এখানে নাকি মাশ্‌না কালির বাস। এই দহে নাকি সাধারণ মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়— যোগেন বলে—

> *"অংকা কাশিয়ার ফুল পিরথিমিতে আর কোঠেও খুঁজে পামেন না। হায়রে ফুল আর হায়রে তার বাহার। ফুলে আর নদীতে সি এক্কিবারে হুলাস্থুল কাণ্ড।"* [১০]

এই মায়াবী এলুয়ার দেহের সৌন্দর্যের মধ্যে রহস্যময়তা রয়েছে। ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা কি একেই বলে? প্রশ্ন জাগে। যোগেন মায়নোমতিকে এখন বলে—

> *"কি আর কমো? এলুয়ার বাঁকে যেই না ঘুরিছি, অ্যাটা ডুবা চরে ধাক্কা খাইয়ে হামাহোরের বাঁশের চালি সোজা গিয়া সিনধালো এলুয়ার দহের ঘুর্ণিত!*

তাবাদে মিরকা মাছে যেংকা হুইল বর্শির ফাতন্ টানে অংকা হামাহোরের দশা। ..... তুমি বিশ্বাস করবে না ভাউজ, হঠাৎ দক্ষিণ পাড়ে তাকায়া দেখি—

— দেখি কি, কবিরাজ গুণমান পাড়ের উচা জমিত নাপাচ্ছে!

— নাপাচ্ছে।

— নাপাচ্ছে কিবা চিল্লাচ্চে, আর মুঠা মুঠা ধূলা তুলে নদীতে ছুড়া দিচ্ছে। ইদিকে হামাহোরের ভড় ডুবছে তো ডুবছেই। নিচে তাক্যে দেখনো বালা নাই।

— বালা নাই!

— বালা জলের তলায় আর তা বাদে মঁয় নিজে।

অতবর বাঁশের চালি অশান্ত ঘূর্ণির মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল দুই সওয়ারকে নিয়ে। কত নিচে তা যোগেন কিংবা বালা কেউ কি জানে? তারপর সেইজল থেকে জ্যা মুক্ত তীরের তীব্রগতিতে ভড় ভাটির দিকে ছুটে যায়। চেতনার শেষ বিন্দুতে পৌঁছে দুজনের টের পায়, ভড় মুসিধাপের ঘাটের কাছে অপেক্ষাকৃত শান্ত স্রোতে ভাসছে। ভাগ্য ভাল সময় থাকতে দুজনে দুজনকে চালির সঙ্গে গামছা দিয়ে বেঁধে নিয়েছিল।”[১১]

অর্থাৎ এলুয়ার দহে কাণ্ডজ্ঞান হারানো, তারপর দহের কেন্দ্রের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে চলা, গুণমানের মন্ত্রপড়া, আবার ভড়ের বেরিয়ে আসা, ইত্যাদির মধ্যে রহস্যময়তা আবদ্ধ রয়েছে। বাস্তবতার থেকে অধিবাস্তবতার ছাপই বেশি। তবু যেন কোথাও অবিশ্বাসের জায়গা নেই। ঐন্দ্রজালিকের মোহমুগ্ধতা পাঠককে আবিষ্ট করে। অভিজিৎ তার কথার বুননের দ্বারা পাঠককে সেই এক মায়ার জগতে নিয়ে গেছে যেখানে সত্য-অসত্য বিচার সম্ভব নয়। এখানেই তার সাফল্য।

এতবড় দুর্ঘটনার পর মায়নোমতির মনে হয় তার বালা মাশনা কালির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে গুণমান কবিরাজের জন্য। আর তাই মায়নোমাতি যোগেনকে বলে, বালাকে ডাকো। আমি মনসার গান পূজা করব। এই যে বিশ্বাস এতে তিলমাত্র অবকাশ নেই অবিশ্বাসের। বালা তাই মায়ের কথামতো গুণমান কবিরাজের বাড়িতে যায় মনসার দিন-তারিখ ঠিক করতে ও গুণমানকে কৃতজ্ঞতা জানাতে৷ আর সেখানেই ঘটে সেই দুর্ঘটনা। যে দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা উপন্যাসের শরীর রচিত হয়েছে। গুণমানের কথিত স্ত্রী বিদ্যাধরীর সঙ্গে এখানেই প্রথম আলাপও চোখাচোখি হয়। দুজনেই দুজনের প্রতি কাঙাল হয়। অবশেষে দুজনেই দুজনকে নির্ভর করে এবং বালা রাজকিশোরের বিশহাজার টাকার কাপড় নিয়ে বাপ রাজকিশোরকে প্রতারণা করে।

কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু অন্য জায়গায়। পৌরাণিক কাহিনিতে লখিন্দর তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেমন তার পিতা-মাতা স্বজনদের কাঁদিয়েছে, দুঃখ দিয়েছে। উপন্যাসের বালা লখিন্দরও তেমনি পিতা-মাতা স্বজনকে কষ্ট দিয়েছে। দুটি চরিত্রের সাদৃশ্য যেমন আছে বৈসাদৃশ্যও কম নয়। বালা লখিন্দরের বাঁশের ভড় আনতে যাওয়া, এলুয়ার দহে পড়া, তার থেকে উদ্ধার পাওয়া গুণমানের সাহায্যে এবং মায়ের নির্দেশে গুণমানের বাড়ি যাওয়া প্রতিটি ঘটনায় যেন নিয়তির নিয়মেই হয়েছে। কারণ বালার সর্বনাশ যেখানে, সেখানেই বালা শেষ পর্যন্ত

হাজির হয়। এ সবই যেন পরিকল্পিত। যেমনটি পৌরাণিক লখিন্দরকে সাপে কামড়ানো। শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তা আটকাতে না পারা। যুগে যুগে বালারা এভাবেই মানুষের মনে দাগ কেটে, কষ্ট দিয়ে যায়। ঔপন্যাসিক দুই লখিন্দরের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিল। ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা যার মূল আধার।

হাইস্কুল মাষ্টার বিষ্ণুপদ থানা পঞ্চায়েতের সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান অভয় ঘোষ ইত্যাদির সামনে গুণমানের সম্পত্তির হিসাব হয়। উইল মোতাবেক সমস্ত সম্পত্তি বিদ্যাধরীর নামে। কিন্তু মায়নোমতির জেদ কোনো মতে কমেই না। সে কোনো অবস্থাতেই বিদ্যাধরীকে পুত্রবধূ মেনে নিতে রাজি নয়। এদিকে ছেলের জন্য কেঁদে কেঁদে মায়নোমতির শরীরের বেহাল দশা। কথায় কথায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। বালারও কষ্ট হচ্ছে। বালা মাকেও প্রচুর ভালোবাসে কিন্তু বিদ্যাধরীকেও সে ত্যাগ করতে পারে না। উভয়সঙ্কটে বালা। এই দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যেই উপন্যাসটি শেষ হয়।

জামাল রায়বেশিয়ার পঞ্চরসের আসরে ভদ্রেতর সমাজের অশ্লীলতার ছবি ফুটে ওঠে। ভদ্রেতর বলেই কি এরা নিম্নবর্গ, না কি নিম্নবর্গ বলেই এরা ভদ্রেতর ও অশ্লীল এটা তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু অভিজিৎ সেন সেই ভদ্রেতর নিম্নবর্গীয় সমাজের বাস্তব রূপটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। পঞ্চরস আলকাপে আদিরসের ছড়াছড়ি থাকে। কমলালেবুর রসিকতায় আসরের সকলেই প্রায় মাতালের মতো তাঁতিয়ে ওঠে। শীতের রাতেও উষ্ণ উত্তেজনা তাড়া করে। বালা পরে জানতে পারে পঞ্চরসের আসরের ওই কমলালেবুর রসিকতায় অভিনয়কারী মেয়েটা ভিখুর মেয়ে। অর্থাৎ ব্যবসায়িক সার্থে বাপ-বেটিতে এরকম একটি আপত্তিকর চরিত্রে অভিনয় অশ্লীলতাকেই ইঙ্গিত করে।

ঔপন্যাসিক উপন্যাসে চরম এক সত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটান পাঠকের। রাজকিশোরের মা মারা গিয়েছিল অল্পবয়সেই। মাঠা পরে কম্বলের উপর

ভূমিশয্যায় শুয়েছিল সে। সেদিন তার বোনও এসেছে। ফলে একটা শোকের আবহাওয়া চলছে। অথচ রাত নিশুতি হতেই তারা সেই নির্লজ্জ আদিমতায় লিপ্ত হয়েছিল। মায়নোমতিকে হাত দিয়ে ছুঁতেই রাজকিশোরের শয্যায় নেমে আসে সে। স্তনের বোঁটা থেকে ছেলের মুখ সরিয়ে তারা আদিম লীলায় মেতে উঠেছিল। কি নির্লজ্জ ও কী হৃদয়হীন মনে হয়েছিল একটু পরেই। সে তো শুধু একান্ত নিজস্ব মেয়েমানুষের কাছে। কিন্তু বালা, সে তো চলেছে তার প্রেমের দুঃসাধ্য যাত্রাপথে। যেখানে স্বপ্ন, আশার, কূহক বাস্তবের চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে বাস্তবিক।

অভিজিৎ নিজে বলেছেন— আমার সাহিত্যিক জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে— গ্রাম, নগর এবং মহানগর এই তিন অবস্থানেই আমার অভিজ্ঞতা বেশ ব্যাপক। অভিজিৎ সেনের জন্ম ও শৈশব কেটেছে পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামে। কৈশোরেরও বেশির ভাগ সময় কেটেছে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী শহরে। পরবর্তীতে কর্মজীবনের সূত্রে বেশিরভাগ সময় কেটেছে উত্তর বাংলার ছোট শহর ও ছোট ছোট গ্রামে। বিশেষত দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, কোচবিহার ও দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ব্যাঙ্কের চাকরীর সূত্রে দিনের পর দিন কখনও কখনও রাতও কাটিয়েছেন প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে। আর তাই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। এর ফলে বঙ্গের সমাজ, সংস্কৃতি, উন্নয়ণ, প্রশাসন এবং রাজনীতির মধ্যে নানা ভূমিকায় জড়িয়ে পড়ার সৌভাগ্য এবং দূর্ভাগ্য তাঁর দুই-ই ব্যাপকভাবে হয়েছে। সেখানকার লোকজীবনের অবস্থান, লোককথা, লোকধর্ম, লোকবিশ্বাস, লৌকিক আচার, অবিচার, সংস্কার ইত্যাদির অভিজ্ঞতার উপাদান তিনি অনুসন্ধান করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি লোককথার আখ্যানকে নানাভাবে উপন্যাসে বিন্যস্ত করে দেখিয়েছেন। আখ্যানের অংশ, চরিত্র, গান, ছড়া, মঙ্গলকাব্য, লোকধর্ম, লোকবিশ্বাস ইত্যাদির গভীরে তিনি পৌঁছেছিলেন। আর তার ফলস্বরূপ উত্তর ঔপনিবেশিক আধুনিক উপন্যাস

অভিজিৎ সেন পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরেছেন। এইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসল 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাসটি। যেখানে ঔপন্যাসিক বাস্তব ও অধিবাস্তবতার মিলন ঘটিয়ে ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার আবহে উপন্যাসটি পরিবেশন করেছেন।

'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাসে অভিজিৎ সেন যেমন বাস্তব ও অধিবাস্তবতার দোলাচলতা দেখিয়েছেন তেমনি উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক, অন্ত্যজ গ্রাম্য সমাজের লোকবিশ্বাস, লোককথা, লোকাচার, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে মধ্যযুগীয় আবহে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে বাস্তব ও কল্পনা পরস্পর সম্পৃক্ত হয়নি। বাস্তব ও কূহক এখানে আলাদাভাবে সনাক্ত করা অসম্ভব নয়। উপন্যাসের নামকরণের মধ্যে এই ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে। বিদেশী-স্বরস্বতী-বকুলবালা-সনেকা ইত্যাদি চরিত্রগুলি বিদ্যাধরীকে কেন্দ্র করে জড়িয়ে রয়েছে জটিল এক আবর্তের মধ্যে। উপন্যাসে দেখি—

> *"বছরখানেক আগে বালা এই পালা শেষবারের মতো দেখেছিল। শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বাকি সময়টুকু বালা মঞ্চের ফাঁকা জায়গাটুকুর দিকে তাকিয়ে মুহ্যমানের মতো বসেছিল। তার খরদৃষ্টি আর কিছুই দেখছিল না, দেখছিল শুধু মঞ্চটুকু। সেই শূন্য মঞ্চ কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখে মায়ামঞ্চ হয়ে উঠেছিল। সেই মায়ামঞ্চে সে বিদ্যাধরীকে দেখল। ... সে ততক্ষণে জেনে ফেলেছে যে এই পালা কাহিনির ভিতরে বালা লখিন্দরও ঢুকে পড়েছে। তার আর বেরিয়ে আসার উপায় নেই।"*[১২]

বস্তুত বিদ্যাধরীকে কেন্দ্র করে বালার দ্বৈত-দ্বান্দ্বিকতা তার পুরুষ মনকে

ব্যথিত তোলে। এদিকে মায়ের কষ্ট দেখে বালার বুক ভেঙে যাচ্ছে আবার অন্যদিকে বিদ্যাধরী তার মর্মের গেহেনি, কামনা, বাসনা, আসক্তি। ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে পুরুষ বালা লখিন্দর। কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে বালা শেষ পর্যন্ত বিদ্যাধরীর আড়চোখের চাহনিকে এড়াতে পারে নি। বিদ্যাধরীর সঙ্গে বালা চলে যায়। কোথায় কোন রূপ কথার নগরে তারা পাড়ি দেবে জানে না। বাস্তবকে অধিবাস্তবতায় রূপান্তরিত করে তোলে বালা যখন দৃপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠে—

> *"বালা বলল, ভয় নাই বিদ্যাধরী, হামার নাম বালা লখিন্দর। এ যাত্রায় তুমি সওয়ারি হামি চড়নদার। আগ্‌লা জন্মের দেনা শোধ করমো।"*[১৩]

বালা ও বিদ্যাধরী নৌকা থেকেই দেখে এলুয়ার দহে গুণমাণের চিতা জ্বলছে। রহস্যময়ভাবে একটা হাত চিতার বাইরে কাউকে যেন নির্দেশ করছে। আলো ও অন্ধকারের রহস্যময়তাকে ঔপন্যাসিক তুলে ধরতে চেয়েছেন।

উপন্যাসের শেষে রাজকিশোর লখিন্দরকে দেখে মনে মনে সংলাপ করেছে—

> *"রাজকিশোর মুগ্ধ হয়ে দেখছিল তার ছেলেকো ঋজু শালবল্লার মতো দেহকান্ত তাই লখাইয়ের। আর কি মানিয়েছে দুজনকে, যেন সত্যিই বেহুলা-লখিন্দর, যদিও ঝড়ে বিদ্ধস্ত, আক্ষেপে বিপর্যস্ত তার লখাই।"*[১৪]

অভিজিৎ সেন উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমির অন্ত্যজ প্রান্তিকায়িত সমাজের প্রায় অনাবিষ্কৃত, অন্ধকার গলি-খুঁজিতে যেভাবে সার্চলাইট ফেলে বাস্তব ও অধিবাস্তবতার মানসিক রূপান্তর তুলে ধরেছেন তা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিরল দৃষ্টান্ত।

নবম অধ্যায়

তথ্যসূত্র :

১. 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর', অভিজিৎ সেন, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃঃ ১

২. তদেব, পৃঃ ১

৩. তদেব, পৃঃ ৫

৪. তদেব, পৃঃ ৫

৫. তদেব, পৃঃ ৪

৬. তদেব, পৃঃ ৬

৭. তদেব, পৃঃ ৭

৮. তদেব, পৃঃ ৭

৯. তদেব, পৃঃ ৮

১০. তদেব, পৃঃ ১০

১১. তদেব, পৃঃ ১১-১২

১২. তদেব, পৃঃ ৪২-৪৩

১৩. তদেব, পৃঃ ৮৯

১৪. তদেব, পৃঃ ৯৫